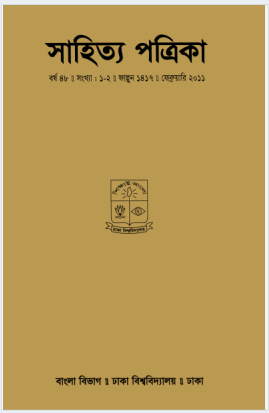

Vol. 48 | No. 1-2 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আবদুল মান্নান সৈয়দের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তজীবন

Volume	48
Issue	1-2
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Momenur Rasul
Published online	February 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i1-2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i1-2.9
Pages	151-165
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আবদুল মান্নান সৈয়দের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তজীবন

Check for updates

মোমেনুর রসুল*

প্রথা ভাঙার অঙ্গীকারে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনা করার অদম্য সাহস আর দৃঢ় মনোবল নিয়ে ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০)। সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে তিনি যেমন প্রশংসিত হয়েছেন তেমনি হয়েছেন বিতর্কিত। মৌলিক সাহিত্য সৃজনের পাশাপাশি গবেষক হিসেবেও মান্নান সৈয়দ অর্জন করেছেন এক ব্যাপক সিদ্ধি। বিশেষত কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এবং জীবনানন্দ দাশকে (১৮৯৯–১৯৫৪) নিয়ে তাঁর শ্রমনিষ্ঠ গবেষণাকর্ম বাংলা মননশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রকে ঋদ্ধ করেছে। উঁচু মানের গবেষক হওয়ার পরও মান্নান সৈয়দ সৃজনশীল রচনার ক্ষেত্রে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও বিশিষ্টতার দাবিদার। ছোটগল্পকার আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য স্মরণযোগ্য :

> গল্প লিখছি বছর পঁচিশ হ'য়ে এলো। অনেকগুলো মাধ্যমে আমি কাজ করলেও ছোটগল্পই আমার সবচেয়ে প্রিয় মাধ্যম। গল্প লিখেই তৃপ্তি পাই সবচেয়ে বেশি । একটি গল্প মানে এক বিশ্ব। এক নিজস্ব পৃথিবী নির্মাণ।[১]

বস্তুত আবদুল মান্নান সৈয়দের ছোটগল্প সমকালীন অন্য গল্প-লেখকদের থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। তিনি প্রচলিত প্রথার বাইরে গিয়ে স্বকীয় এক গল্পভুবন গড়ে তুলেছেন। গল্পের বিষয়-ভাবনায় এবং আঙ্গিক-নিরীক্ষায় তিনি বরাবরই কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'তাঁর ছোটগল্পের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিষয়-বৈচিত্র্য'।[২] মানুষের মনোজগতের রূপায়ণ তাঁর ছোটগল্পের প্রধান চারিত্র্যলক্ষণ হলেও কেবল এ ধারায় তিনি স্থির থাকেননি। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে এবং অর্থনৈতিক বিবেচনায় সমাজে বসবাসরত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন রূপায়ণেও তিনি একজন সফল কথাশিল্পী। মূলত নাগরিক মধ্যবিত্তজীবনের সার্থক এই রূপকার প্রচলিত ধারণাকে উপেক্ষা করে পর্যবেক্ষণ করেছেন মধ্যবিত্তের অন্তর্গত শূন্যতা এবং নির্মোহ, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে চিত্রিত করেছেন বিপন্ন মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা ও অতৃপ্তি, দ্বিধা ও গ্লানি, ক্ষয় ও ক্লান্তি, তীব্র হাহাকার ও বেদনা। মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিচিত্রমুখী সংকট উপস্থাপনে মান্নান সৈয়দের ছোটগল্প শিল্পগুণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। শুরুতেই মধ্যবিত্ত শ্রেণিসংক্রান্ত প্রত্যয়টি নিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান আবশ্যক।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংজ্ঞার্থ নির্ণয় অত্যন্ত জটিল বিষয়। কেননা এ শ্রেণির আচার-আচরণ প্রায়ই পরিবর্তনশীল। 'এ ছাড়া একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার সারা জীবন একই শ্রেণি-বলয়ে বিচরণ করবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই'।[৩] তথাপি সমাজ-বিকাশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কখনও গুরুত্বহীন বিবেচিত হতে পারে না। এই শ্রেণির ওপরে-নিচে রয়েছে আরো দুটো স্তর। এর একটি হল উচ্চবিত্ত, যাদের অবস্থান শীর্ষে। আর অপর

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শ্রেণিটি হল বিত্তহীন। যাদের অবস্থান সমাজের নিম্ন স্তরে। অবস্থান বিবেচনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল। কেননা এই শ্রেণির প্রথম তিন প্রবণতা আমরা চিহ্নিত করতে পারি। এর একটি হলো স্বঅবস্থান ধরে রাখা, দ্বিতীয়ত উচ্চবিত্ত শ্রেণিতে প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা, তৃতীয়ত বিত্তহীন শ্রেণিতে নেমে আসার আশঙ্কা। এ কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণি টিকে থাকার সংগ্রামে সর্বদা লিপ্ত থাকে। সীমিত আয় নিয়ে জোড়াতালি দিয়ে বেঁচে থাকার নিরন্তর চেষ্টা তার অব্যাহত থাকে। এ শ্রেণির মধ্যে লোভ-লালসা ও অর্থের প্রতি রয়েছে সুতীব্র আকর্ষণ। মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী শারীরিক শ্রমবিমুখ, পরশ্রমজীবী। 'কায়িক শ্রমজীবীদের শ্রমে উপার্জিত অর্থের ওপর তারা নির্ভরশীল'।[৪] তাই বলে তারা একেবারে শ্রমবিরোধী নয়। তারাও শ্রম দেয় তবে তা কায়িক শ্রম নয়, মানসিক শ্রম। এই অর্থে মধ্যবিত্ত শ্রেণি শ্রমজীবী নয়, পেশাজীবী। তাদের পেশা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। 'কিন্তু জীবনযাত্রার মান ও আচার ব্যবহার মূলত এক ও অভিন্ন'।[৫] 'আধুনিক শিক্ষা ও মনন তাদের অবলম্বন; উন্নত রুচি এবং সংস্কৃতির তারা ধারক ও বাহক'।[৬] এ শ্রেণির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বিনয় ঘোষ তাঁর *বাংলার নবজাগৃতি* গ্রন্থে গ্রেটেনের মত তুলে ধরেন :

> সমাজের সেই শ্রেণীকেই আমরা মধ্যশ্রেণী বলতে পারি, মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রধান নিয়ামক এবং মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রাথমিক উপাদান।[৭]

মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে গ্রেটেন জমিদার ও কৃষকদের বাদ দিয়েছেন, কারণ ভূমি সম্পত্তিই তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণি বলতে শিল্পপতি ও বণিকদের বুঝিয়েছেন যাদের জীবনের সঙ্গে মুদ্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আমাদের দেশে বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যবর্তী স্তরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান। অতএব শিক্ষিত পেশাজীবী এবং বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণি গঠিত। বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিকশিত হয়েছে ঔপনিবেশিক যুগে, ব্রিটিশ শাসকদের স্বার্থে ও নিয়ন্ত্রণে। 'তাদেরকে ইংলন্ডীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর মতো সামন্ত সমাজের বুক চিরে ফরাসি বিপ্লবের মতো সংঘাতময় কোনো অভিজ্ঞতা নিয়ে বিকশিত হতে হয়নি'।[৮] প্রাথমিক পর্যায়ে তারা ঔপনিবেশিক শাসকদের পরিচর্যায় হয়েছে লালিত ও বর্ধিত। সমালোচকের মতে :

> ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়,এই শ্রেণী ছিল এ-দেশে ইংরেজদের ক্ষমতা দখলের সহায়ক ও ইংরেজ শাসনের দেশীয় ভিত্তি। ইংরেজ-শাসকদেরকে সাহায্য করে, ইংরেজ-শাসনকে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত রেখে, দেশের জনগণকে শোষণ ও পীড়ন করে, ইংরেজদের অনুগ্রহ ও সহায়তা লাভ করে এই শ্রেণীর সদস্যরা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করেছে।[৯]

সমাজবিদদের মতে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্তের উদ্ভবকাল উনিশ শতকে; যার উত্থান ঘটে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে। ব্রিটিশ শাসকের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা এবং তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এ শ্রেণির প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারি স্বার্থরক্ষা এবং আপন ভবিষ্যৎ নির্মাণ। ইংরেজ শাসনামলের প্রথম পর্যায়ে আধুনিক শিক্ষার অপ্রতুলতায় অভিজাত মুসলমানেরা ছিলেন জীবনবিমুখ, আত্মবিবরচারী, অতীতমুখী। ব্রিটিশ বৈরিতায় তাদের জীবনে নেমে আসে শোচনীয় পরাজয়। পরাজয়ের দুঃসহ গ্লানি বহন করে অতিবাহিত হয়েছে তাদের ব্যাপক সময়। অপরদিকে ইংরেজি শিক্ষার সুবর্ণ সুযোগ আহরণে হিন্দুসমাজ এগিয়ে

এসেছে অবাধে আপন আগ্রহে। ফলে কলকাতায় বিকশিত এই হিন্দু-মধ্যবিত্ত শ্রেণির সাথে তাদের কোনো সংযোগ স্থাপিত হতে পারেনি। স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক থেকে শুরু করে উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণায় এবং সৃজনশীল রচনায় হিন্দু-মধ্যবিত্ত শ্রেণি মুসলমানদের থেকে এগিয়ে ছিল। বাঙালি হিন্দু-মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাশে ইংরেজের সক্রিয় সহযোগিতার যে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, মুসলিম-মধ্যবিত্ত শ্রেণির সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কারণেই ইংরেজের সেরূপ মনোভঙ্গি অনুপস্থিত। বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যচেতনা, আত্মসচেতনতা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে স্বকীয় পথ সন্ধানের পরিপ্রেক্ষিত রচিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে। 'এ সময় পর্বে বঙ্গদেশে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু জনসংখ্যাকে অতিক্রম করে যায়।'[১০]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে এই প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। ইংরেজের আনুকূল্যে যে হিন্দু-মধ্যবিত্তের উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটে, এক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা ও সাধনায় তা সাংগঠনিক চারিত্র্য অর্জনে সমর্থ হয়। গণতন্ত্রমনা ও স্বাতন্ত্র্যকামী এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির রাজনীতি চেতনার প্রকাশ ঘটে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গই ছিল কংগ্রেসের চালিকাশক্তি। ব্রিটিশ রাজশক্তি প্রথম দিকে কংগ্রেসের প্রতি অনুকূল মনোভাব প্রদর্শন করলেও এ প্রতিষ্ঠানে ক্রমাগত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এরা রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা সচেতন জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়। '১৮৮৫-১৯০৫ কাল পরিসরে উদারনৈতিক ও চরমপন্থী ব্যক্তিবর্গ কংগ্রেসের নেতৃত্ব দান করেন'।[১১] এ সময় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে মুসলমান জনগোষ্ঠীর দ্বিধার পরিচয় সুস্পষ্ট। রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান কংগ্রেসকে নিঃসংশয়ে গ্রহণ করতে পারেনি। 'কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা শতকরা দশ ভাগ'।[১২] স্বল্প সংখ্যক উদারনৈতিক মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনের কথা বললেও প্রভাবশালী মুসলমান নেতা ও সাংবাদিকরা এর বিরুদ্ধাচরণ করে। মুসলমানদের এই মনোভঙ্গির পেছনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহ।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক পর্যায়ে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উদারপন্থি ও চরমপন্থি এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসনামলে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তের অসম বিকাশের ফলে যে ঐতিহাসিক বিরোধের সূচনা হয়েছিল, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ প্রশাসন তাকে স্থায়ী রূপ দিতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি বাঙালি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী বিভক্তিরও সূত্রপাত ঘটে। শিক্ষিত হিন্দু-মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও কংগ্রেস নেতৃবর্গের বিরোধিতা সত্ত্বেও বঙ্গবিভাগ কার্যকর হয়। এর ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসামের সমন্বয়ে একটি প্রদেশ গঠিত হয় এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে গঠিত হয় অপর প্রদেশ। নিম্ন শ্রেণিভুক্ত হিন্দু-সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করলেও বাংলায় হিন্দু-সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে। বঙ্গ বিভাজনকে কেন্দ্র করে তাদের পারস্পরিক সুসম্পর্কের

অবনতি ঘটে। হিন্দুরা হলেন ব্রিটিশবিদ্বেষী ও মুসলিম-বিরূপ। অপরদিকে মুসলমানেরা হিন্দুদের প্রতি হয়ে উঠলেন সন্দেহপরায়ণ। এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অভাবে লাভবান হয়েছে ব্রিটিশ সরকার, এ দেশবাসী নয়। অর্থাৎ ব্রিটিশের 'বিভাজন ও শাসন' নীতিই ফলপ্রসূ হয়েছে।

বঙ্গভঙ্গ বাস্তবায়নে হিন্দু-মধ্যবিত্ত শ্রেণির আপত্তি যেমন প্রত্যাখ্যাত হয়, তেমনি মুসলিম অসম্মতি অগ্রাহ্য করে তা বাতিল হয়ে যায়। 'বঙ্গ বিভাজন ঘোষণায় হিন্দুরা হয়েছিলেন প্রতিবাদী অপরদিকে তার বিলোপ সাধনে মুসলিম মধ্যবিত্ত হলেন ব্রিটিশ বিরোধী'।[১৩] বিক্ষুব্ধ এই নব্যশিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির সন্তুষ্টির জন্য ব্রিটিশ সরকার নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে 'মুসলমানদের শিক্ষা ও চাকরির যথাযথ সুবিধা প্রদান, পৃথক শিক্ষা, বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগ, বৃত্তি ও অর্থ বরাদ্দ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অন্যতম'।[১৪] '১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্কুল কলেজ থেকে উত্তীর্ণ নব্যশিক্ষিতদের সমবায়ে ক্রমবিকশিত হচ্ছিল ঢাকা শহরকেন্দ্রিক এক মধ্যবিত্ত শ্রেণী'।[১৫] 'শক্তি সঞ্চয় করে চল্লিশের দশকে তারা হয়ে উঠল সজাগ ও সচেতন এবং স্বাধীনতা ও আপন প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সচেষ্ট, সক্রিয়'।[১৬]

মুসলিম স্বার্থরক্ষায় বঙ্গ বিভাজনের আয়োজন এবং উনিশ শতকের শেষাংশে মুসলমানদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন— ইংরেজ শাসকদের এই জাতীয় রাজনৈতিক ভূমিকা হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্তের ভেতরে স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম দেয়। মুসলিম মধ্যবিত্ত ক্রমাগত ইংরেজি শিক্ষায় এগিয়ে আসতে থাকে। ফলে চাকরি প্রার্থী হিসেবে হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্ত হয়ে ওঠে পরস্পরের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বী । বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতায় মুসলমানদের একটি অংশ হয়ে উঠল কংগ্রেসবিরোধী। তারা ভাবল কংগ্রেসের ভূমিকা মুসলিম স্বার্থের অনুকূল নয়, বরং প্রতিকূল। আপন অস্তিত্ব রক্ষায় গঠিত হল মুসলিম লীগ; অপরদিকে হিন্দু-মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবাদী চেতনা যতটা বিকশিত হয়েছে, আপন স্বার্থের বিবেচনায় ইংরেজ সরকারের মুসলিম প্রীতি হয়েছে ততটা প্রবল। বঙ্গভঙ্গের ফলে কংগ্রেস নরম পন্থা পরিহার করল, তারা ইংরেজের বিরুদ্ধে হয়ে উঠল ক্ষুব্ধ এবং প্রবল প্রতিবাদী। ইংরেজ সরকার দমননীতির আশ্রয় নিল, ফলে বাংলাদেশব্যাপী সূচিত হল বিপ্লববাদী উত্থান। বিপ্লববাদীরা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু। সরকার তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের গোয়েন্দাবাহিনীতে নিয়োগ দিল। এরই প্রতিক্রিয়ায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক হয়ে উঠল বৈরিভাবাপন্ন। এছাড়া অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে হিন্দু-মুসলিম মধ্যবিত্তের ভেতরে সাম্প্রদায়িকতাবোধ জাগ্রত হল এবং তা ক্রমেই হতে থাকল প্রবল থেকে প্রবলতর। রাজনৈতিক স্বার্থে কখনো কখনো হিন্দু-মুসলিম নৈকট্য স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রাপ্য সুযোগ সুবিধা ও ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত মুসলিম মধ্যবিত্ত অবতীর্ণ হল পাকিস্তান আন্দোলনে। অধিকার বঞ্চিত সমস্যাদীর্ণ এই মুসলিম মধ্যবিত্ত ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোর অধিবেশনে ঘোষণা করল পাকিস্তান-পরিকল্পনা। লাহোর প্রস্তাবের পর মুসলিম মধ্যবিত্ত ও সামন্ত শ্রেণি এবং নব্য ব্যবসায়ীরা পাকিস্তান-পরিকল্পনাকে স্বাগত জানাল সংকটমুক্ত নিরাপদ ভবিষ্যৎ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষায়। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্যবাদী কতিপয় হিন্দু নেতার উপস্থাপিত 'একদেশ একজাতি' তত্ত্বের প্রবল প্রতিক্রিয়ায়

মুহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এক পর্যায়ে নিশ্চিত হলেন যে, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আর সম্ভব নয়। তখন তিনি দ্বিজাতি তত্ত্বের অবতারণা করেন। এই দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হল মুসলমানদের তথাকথিত স্বপ্নরাষ্ট্র পাকিস্তান। পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির ফলে পূর্ব বাংলা চিহ্নিত হল পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে এবং ঢাকা হল তার রাজধানী। অল্পদিনেই বাঙালির স্বপ্নভঙ্গের সূচনা এবং পূর্ব বাংলার বুকে চেপে বসা পাকিস্তানি জগদ্দল পাথরমুক্ত হতে চব্বিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হলে ভারত ও পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে দেশ ত্যাগ করে। এই বিপুল সংখ্যক শরণার্থী নতুন রাষ্ট্রে এক মানবেতর জীবনের সম্মুখীন হয়। ক্ষুধা, অনাহার, জরা, মৃত্যু এবং জীবিকাহীন এই ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা নিক্ষিপ্ত হয় চরম লাঞ্ছনায়। সমকালীন ছোটগল্পকাররা সংবেদনশীল দৃষ্টি নিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন মানবতার এই বিপর্যয়কে। ফলে তাঁদের গল্পে উঠে এসেছে বাস্তুহারা মানুষের কথকতা, দেশবিভাগ-উত্তর মানবিক দৈন্য, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরতাড়িত নর-নারীর অস্তিত্ব-সংকট। 'সামগ্রিকভাবে এই পর্যায়ের গল্পে লেখকদের মূল অবলম্বন হয়েছে এদেশের অপরিবর্তনশীল গ্রামীণ জীবন।'[১৭] গ্রামজীবন-আশ্রয়ী নিম্নবিত্ত মানুষের ইতিকথাই পঞ্চাশের দশকের গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। পাশাপাশি এ পর্বের লেখকরা সমকালীন রাজনৈতিক প্রতিবেশ থেকে শিল্পের প্রেরণা লাভ করেছেন। সমালোচকের মতে :

> ৫২-এর ভাষা আন্দোলন তছনছ করে ফেলে সামাজিক জড়তা, চূর্ণ করে মানবিক স্থবিরতা ও দাসত্ব এবং ভেঙে দেয় বাঙালির উৎসমুখের সমূহ জটিলতা। নতুন বোধ, উৎসাহ এবং চিন্তার আলো পতিত হয় লেখকের মনোভূমিতে এবং তাঁর শিল্পের হৃদপিণ্ডে।[১৮]

পঞ্চাশের দশকের এই বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে প্রোথিত হয় ষাটের দশকের ছোটগল্পের মূল ভিত্তিভূমি। ১৯৫৮-তে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় স্বৈরশাসক আইউব খানের আগমন পূর্ববঙ্গবাসীকে করে তোলে উদ্বিগ্ন। 'ষাটের দশকের লেখকদের কৈশোরের শেষ এবং যৌবনের শুরু সামরিক শাসন দিয়ে চাপা।'[১৯] এ পর্বের লেখকেরা ছোটগল্পের বিষয়-নির্বাচনে এবং শিল্প-চেতনার ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তন করেন। নির্যাতিত গ্রামীণ নিম্নবিত্ত মানুষের অনলংকৃত জীবন অপেক্ষা সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসে এবং অর্থনৈতিক বিবেচনায় সমাজে বসবাসরত শাহরিক মধ্যবিত্তের জীবন চিত্রণে তারা অধিক মনোযোগী হয়ে ওঠেন। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সার্থক রূপকার আবদুল মান্নান সৈয়দের ছোটগল্পে মধ্যবিত্তজীবন বর্ণাঢ্যভাবেই উপস্থাপিত হয়েছে। সাতটি গল্পগ্রন্থ[২০] আর দুটো নির্বাচিত গল্পসংকলন[২১] এ পর্যন্ত প্রকাশিত হলেও মান্নান সৈয়দের অগ্রন্থিত গল্পের প্রকৃত সংখ্যা এখনও নিরূপিত হয়নি। আমাদের আলোচ্য গল্পগ্রন্থসমূহের বিভিন্ন গল্পে মধ্যবিত্তজীবনের বিচিত্রমাত্রিক প্রকাশ লক্ষণীয়।

আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রথম এবং স্বাধীনতা-পূর্বসময়ে প্রকাশিত একমাত্র গল্পগ্রন্থ *সত্যের মতো বদমাশ* (১৯৬৮)-এর অন্তর্ভুক্ত বারোটি গল্পেই মধ্যবিত্তের জীবন অঙ্কিত হয়েছে। সমকালীন সমাজে অবক্ষয়-পচন আক্রান্ত মধ্যবিত্তের মনন ও যৌন-জীবনের স্বরূপ উন্মোচনের পাশাপাশি এসব গল্পে লেখক এ শ্রেণির স্বপ্ন-সম্ভাবনার কথাও উপস্থাপন

করেছেন। মধ্যবিত্তের পলায়নবাদী মনোবৃত্তির যথার্থ রূপটিও কোনো কোনো গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া মূল্যবোধের সংকট, উদ্ভট কামনা-বাসনা, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতায় সৃষ্ট শূন্যতাবোধ-আক্রান্ত মধ্যবিত্ত মানুষের জীবন রূপায়ণে উপর্যুক্ত গল্পসমূহ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

সত্যের মতো বদমাশ গ্রন্থের প্রথম গল্প 'সত্যাসত্য' (১৯৫৯) এক মধ্যবিত্ত পিতার আপন পুত্রকে ঘিরে লালিত স্বপ্ন রচনার শৈল্পিক প্রতিভাস। আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি মাহমুদ যে 'মাত্র কয়েক বছরের কেরানি-জীবনে বেশ কয়েক শো টাকা জমিয়েছে।'[২২] শাহরিক জীবনে একাকী বসবাস করলেও গ্রামে স্ত্রী জমিলা আর একমাত্র পুত্র জাদুর জন্য সে সুন্দর আগামীর স্বপ্ন রচনা করে। আর তাই :

> গ্রামাঞ্চলে কিছু জমি আর বাড়ি নিয়ে থাকা জমিলার মতো তারও সাধ। প্রথম প্রথম মাহমুদ আপত্তি করেছিলো। তার যে-চাকরি তাতে ঢাকা শহরেই থাকতে হবে, গ্রামে বাড়ি করে কোনো লাভ হবে না। কিন্তু জমিলার যুক্তি ও বুদ্ধিতে তার মত পরিবর্তিত হয়েছিলো। সকালে সবুজ ঘাসের ডগায় ফোঁটা ফোঁটা শিশির ঝকমক করবে, দুপুরে গাছে গাছে ঘুঘু ডাকবে আর সারারাত আকুল হয়ে গন্ধ ছড়াবে হাস্নাহেনা আর রজনীগন্ধা— সত্যি তো,নিজের বাড়ি হবে, সেখানে কি সুখেই না থাকবে ওরা। জাদু বড়ো হবে, বাড়ি করবে, গাড়ি করবে।[২৩]

সুন্দর আগামীর স্বপ্নে বিভোর মাহমুদ আপন পুত্রকে নিয়ে উচ্চাশা করলেও গল্পের অন্তিমে পুত্রের অকালমৃত্যু সংহার করে তার সমস্ত কল্পনা। জাদুর মৃত্যু পিতা মাহমুদকে করে তোলে আশাহত, বেদনাবিক্ষত। ফলে মধ্যবিত্ত মাহমুদের লালিত স্বপ্ন অধরাই থেকে যায়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্বিধা ও গ্লানির এক অসাধারণ চিত্র বর্ণিত হয়েছে 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ' (১৯৬২) শীর্ষক গল্পে। উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণে রচিত এ গল্পের কথক চরিত্রটির মানসিক দ্বিধা আর তার বিধবা মায়ের আত্মগ্লানির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মান্নান সৈয়দের প্রাগ্রসর শিল্পদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। বিধবা মাকে জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে আন্তরিক আলাপচারিতায় ও ঘনিষ্ঠ হতে দেখে মধ্যবিত্ত যুবক আতিকুল্লাহর সামাজিক মর্যাদাবোধ হয়েছে দ্বন্দ্বসংকুল, ক্ষতবিক্ষত। দর্শনের দারুন ছাত্র আতিকুল্লাহর কাছে মায়ের পরপুরুষ আসক্তি হয়ে উঠেছে দ্বিধাবিভক্ত, অসম্মানজনক ও মর্যাদাহানিকর। বিয়ের যোগ্য পুত্রের সামনে মায়ের শোভনহীন অসংকোচ আচরণ হয়ে পড়ে অসহনীয় :

> বেদনা—কেননা এখন যে সবাই বুড়ো আঙুল তুলে দুয়ো দেবে, এত বড় ছেলের সম্মুখে মার এই কাণ্ড আমার পক্ষে অসহ্য।[২৪]

লোকনিন্দা ও সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপের আশঙ্কায় আতিকুল্লাহ হয়েছে বিচলিত, উৎকণ্ঠিত। অপরদিকে বিধবা মায়ের এই পঙ্কিল আচরণ তাকে করে তুলেছে অপরাধীতুল্য :

> মা দেখি আগের মতো খোলাখুলিভাবে অপেক্ষা করেন না আর, আর সবচেয়ে খারাপ লাগে আমার-মা-র সংকোচ; সারাক্ষণ একটা সংকোচ আর অপরাধ যেন তাঁকে ঘিরে থাকে — কিছুতেই আগের মতো সহজ স্বাভাবিক হতে পারেন না আমার কাছে। আগে আমাকে 'তুই' বলে ডাকতেন, আজকাল দেখি 'তুমি' বলেন।[২৫]

একদিকে মধ্যবিত্ত মায়ের গ্লানি-আশ্রিত জীবনাচরণ অপরদিকে পুত্রের দ্বান্দ্বিক মানসিকতার টানাপড়েনে গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

মধ্যবিত্তের পলায়নবাদী মনোবৃত্তির অনবদ্য প্রকাশ ঘটেছে 'ভয়' ও 'সত্যের মতো বদমাশ' (১৯৬৩) শীর্ষক গল্পদ্বয়ে। 'ভয়' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র জনৈক যুবক :

> চোখ দিয়ে সে এমন অনেক দৃশ্য পান করেছে, যার বর্ণনা দিতে তার মুখ লাল হতে হতে কালো হয়ে উঠবে এবং অমন আর দৃশ্য দেখাবার জন্য ভিতরে আকুলতা ছিলো তার; আর তার পা এমন অনেক জায়গায় গিয়েছে এবং যেতে চেয়েছে, যা শুনলে তার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবেরা হিংসার আনন্দে নাচতে শুরু করে দেবে; আর তার জিভ এমন অনেক কথা অনেক বলেছে এবং বলতে চেয়েছে, যা শুনলে তার আব্বা-আম্মা কানে আঙুল দেবেন; আর তার অপরাপর অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় এমন অনেক কাজ করেছে বা করতে চেয়েছে, যা জানলে ভুরু-গাঁথা বিচারক সবচেয়ে ক্লিন্ন মানুষের প্রতিনিধি তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেবেন।[২৬]

মধ্যবিত্ত পরিবারের এই পলায়নবাদী যুবক একটি মেয়ের সাথে স্থাপন করেছে শারীরিক সম্পর্ক এবং এর ফলে সে হতে চলেছে একটি অবৈধ সন্তানের জনক। মেয়েটি এমন যে তার সাথে সম্পর্ক নির্মাণ সমাজ-সিদ্ধ নয়; আইনত ন্যায়ত নিষিদ্ধ। ফলে যুবকটির আত্মভাষ্যে লেখক বলেন :

> আইনত ওকে বিয়ে করতে পারি না, সমাজ বা ধর্মের মতে এ ধরনের চিন্তা করাও পাপ। ভালোবাসার কথা জানিনা, কিন্তু শরীরের দিক দিয়ে আমরা পরস্পরকে নিরন্তর কামনা করেছি। — এ আমি ভালোভাবে জানি।[২৭]

অবশেষে মধ্যবিত্ত যুবকটি জীবন থেকে পালাতে গিয়ে 'এক হাতে দড়ি আরেক হাতে সাপের ভয়ে আঁধারের ভয়ে হারিকেন নিয়ে'[২৮] আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়। উল্লেখ্য, এই গল্পের কাহিনী-সংগঠনে ও বর্ণনায় জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার অনুষঙ্গগত সাদৃশ্য অনুমেয়। জীবনানন্দের কবিতায় যন্ত্রযুগের জটিলতায় বিপন্ন মানুষটি 'একগাছা দড়ি হাতে' 'একা একা অশ্বত্থের কাছে' গিয়েছিল আত্মহননে, আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রটিও 'এক হাতে দড়ি' নিয়ে 'প্রাচীন গাছটির' কাছে গিয়েছে আত্মঘাতী হবার প্রয়াসে; তবে এক্ষেত্রে কারণটি হল তার জৈবিক লালসায় জনৈক তরুণীর গর্ভবতী হওয়া এবং তজ্জনিত লোকটির গভীর ভীতি ও আতঙ্ক। মধ্যবিত্তের এই পলায়নবাদী মনোবৃত্তির স্বরূপ অঙ্কনে মান্নান সৈয়দের 'ভয়' গল্পটি বিশিষ্টতার দাবিদার।

'ভয়' গল্পে জনৈক যুবক সমাজের অনুশাসন আর আত্মীয়স্বজনের ভয়ে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়ে নিজ অপকর্ম থেকে মুক্তি পেতে পালাতে চেয়েছে। অপরদিকে 'সত্যের মতো বদমাশ' গল্পে খোকাকে নিয়ে মেলা পরিভ্রমণরত মায়ের নিরুদ্দেশ হওয়াও মূলত মধ্যবিত্তের পলায়নবাদী মনোবৃত্তির বহুলাঙ্গিক প্রকাশ। মানুষের বাহ্যিক রূপের অন্তরালে থাকে তার রহস্যময় প্রবৃত্তিগত জগৎ। অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের চেতন জগতের অন্তর্মূলে রয়েছে অবচেতন স্তর। মেলার কোলাহলমুখর জগৎ থেকে মায়ের আকস্মিকভাবে নিরুদ্দেশ হওয়া এবং 'তোর মারও এতে মনে মনে শায় আছে'[২৯] — অজ্ঞাত লোকদের এই অশ্লীল ইঙ্গিতময় উক্তি মা-চরিত্রের রহস্যময়তাকে ঘনীভূত করে। সমালোচকের মতে :

মেলায় আনন্দ-কোলাহলমুখর পরিবেশ মানব-অস্তিত্বের বাহ্য সচেতন স্তরের রূপক এবং অকস্মাৎ সচেতনভাবে মায়ের নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া তার অবচেতন স্তরের অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহায়িত জটিল প্রবৃত্তির প্রতীক।[৩০]

আবদুল মান্নান সৈয়দ মধ্যবিত্ত নরনারীর যৌন লালসা ও চিত্তবৈকল্যের পরিচয় প্রদানে অত্যন্ত কুশলী ও পারদর্শী। তাঁর 'অধঃপতন' (১৯৬৪), 'সমীচীন মানব' (১৯৬৫) গল্পে মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবক্ষয়-বিবরে নরনারীর দেহগত লালসা সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। ইন্দ্রিয় লালসায় আক্রান্ত নরনারীর চিত্তগত সংকট গল্পদ্বয়ে ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। 'অধঃপতন' গল্পে অধ্যাপক শাহেদ আলি 'লাজুক গম্ভীর আত্মমগ্ন'[৩১] রূপে সমাজে পরিচিত হলেও বারবণিতা ফিরোজার নিবিড় সান্নিধ্যে বিচরণ করতে চান, হাত ধরে পথ চলতে চান। হাত ধরে পথ চলায় তিনি নিরাপদ বোধ করেন না, গভীর লোকলজ্জায় হয়ে ওঠেন আতঙ্কবিদ্ধ। তাই অধ্যাপক শাহেদের প্রমোদচারণ চলে সন্তর্পণে। একদিকে বারাঙ্গনা নারীর নিবিড় সান্নিধ্য পাবার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে লোকলজ্জার ভয় — এ দুয়ের সাংঘর্ষিক সংশ্লেষে মধ্যবিত্ত অধ্যাপকের চিত্তবৈকল্য দেখা দেয়। অধ্যাপকের যৌনলালসা এবং চিত্তগত সংকটের চিত্র নিম্নরূপ :

একটা অটো রিকশায় চড়ে বসলো তারা সদরঘাটে যাবার নির্দেশ দিয়ে। সে দেখতে পেলো, চালকের ঠোঁটে চুলের মতো সূক্ষ্ম হাসি খেলে গেলো যেন। কে জানে, ওসব টের পেয়ে গেছে কিনা? কী করে যে ওরা সব টের পেয়ে যায়? চলার সময় ঝাঁকুনিতে মেয়েটা বারবার তার গায়ের উপরে এসে পড়ছিলো, খানিকটা যেন ইচ্ছে করেই, একবার মোড় ঘোরবার সময় একেবারে তার কোলের উপরে এসে পড়লো। এটা তার মোটেই খারাপ লাগছিলো না; বরং মেয়েটির এই ন্যাকামিতে তার খোলা উজ্জ্বল পেট ও বাহুর সঙ্কোচন, প্রসারণে, প্রসাধনের তীব্র পরিমলে অপরূপ বিদেশি উত্তেজনার স্বাদ পাচ্ছিলো সে, কেননা এতো কাছ থেকে কোনো মেয়ের সান্নিধ্য তার জীবনে এই প্রথম। সদরঘাটের মোড়ে তারা নেমে পড়লো; সেখানে থেকে পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে চললো — অনেকে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলো তাদের, খুব ভালো লাগছিলো তার। এত রাতেও গগলস্-পরা, ঘাড়ে রুমাল-বাঁধা, হাতে সোনালি চেনের ঘড়ি এরকম দু-তিনটি ছোকড়া মুখ টিপে হাসলো তাদের দেখে। মনে মনে ভীষণ ঘাবড়ে গেলো সে, 'ওরা কি বুঝে ফেলেছে? মেয়েটাকে কি, চেনে ওরা? মহা মুশকিল, পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সর্বনাশ হবে'।[৩২]

মধ্যবিত্তের স্বঅবস্থান অটুট রাখার নিরন্তর প্রয়াস তাই অব্যাহত থাকে অধ্যাপক শাহেদ আলীর জীবনাচরণে।

'সমীচীন মানব' গল্পেও ইন্দ্রিয়লালসায় আক্রান্ত এক মধ্যবিত্ত যুবকের একই সঙ্গে তিনজন নারীর সান্নিধ্যে আসার অসাধারণ চিত্র বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পের নায়ক বিবাহিত সিকান্দর একই ব্যক্তি সত্তায় হয়ে উঠেছে স্বামী, প্রেমিক ও বারাঙ্গনাগামী। স্ত্রী রাফেজার সাথে দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ থেকেও প্রেমিকা সাইফার সাথে সে স্থাপন করেছে ভালোবাসার সম্পর্ক। এ বিষয়ে তার আত্মভাষ্য :

আমি সাইফাকে ভালোবাসি বটে, কিন্তু আমার বিবাহিত জীবন ছেড়ে তাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি বিবাহিত হয়ে প্রেম করতে পারি কিন্তু দ্বিতীয় বিয়ে করা — স্ত্রী বেঁচে থাকতে — আমার কল্পনার অতীত। তাছাড়া রাফেজাকেও কি আমি ভালোবাসি না?[৩৩]

স্ত্রী রাফেজা ও প্রেমিকা সাইফাকে ভালোবেসেই সিকান্দর তুষ্ট নয়, এরপরও সে বারাঙ্গনার সঙ্গ লাভে অগ্রসর হয়েছে। এই ত্রিনারীর সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক তৈরি হবার ফলে আপন অসংগতি সে বর্ণনা করে এভাবে :

> আমি যে সুন্দর প্রেমের কথা বলতে পারি রাফেজা তা জানে না, বেশ্যা মেয়ের সাথে অশ্লীল কথার খই ফুটিয়েছি সাইফা তা কল্পনা করতে পারবে না, আর আমি যে সাংসারিকতায় নিমগ্ন বেশ্যা মেয়েটি কি তা ভাবতে পারে?[৩৪]

মধ্যবিত্ত সিকান্দরের অস্বাভাবিক যৌন লালসা এবং তজ্জনিত তার চিত্তবৈকল্যের চিত্র আলোচ্য গল্পে লেখক অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন।

মধ্যবিত্তের যাপিত জীবনে হতাশা ও ক্লান্তি বরাবরই ক্রিয়াশীল থাকে। প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির সম্মিলন না ঘটলে জীবনে ক্লান্তি আর অবসাদ এসে ভিড় করে। 'সময়ের ঘর' (১৯৬৬) শীর্ষক গল্পে মান্নান সৈয়দ মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের ঘরোয়া চিত্র তুলে ধরেছেন যেখানে বাবা-মা, স্ত্রী মিনা আর ছোট ভাই বাবলুকে নিয়ে কথক প্রত্যাশিত নীড় রচনা করতে সর্বদা ব্যস্ত। সারাদিন অফিসের ফাইল আর হিসাব তৈরি করে যখন সে ক্লান্ত হয়ে আপন নীড়ে প্রবেশ করে তখনই তার ক্লান্তি চূর্ণ হয়ে তাকে অবসাদগ্রস্ত করে তোলে। স্ত্রী মিনার সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক মধুর নয় বরং ক্রমাগত তিক্ত থেকে তিক্ততর হচ্ছে দেখে কথক বলে ওঠে 'আপনাদের সঙ্গে থাকা যাবে না, আমি বাড়ি দেখছি, পেলেই চলে যাবো।'[৩৫]

অবশেষে কথকের প্রত্যাশিত নীড়ে আর অবস্থান করা হয়ে ওঠে না। স্ত্রীকে নিয়ে সুখের নীড় রচনা করতে যখন সে আপন বাড়ি থেকে প্রস্থান করল ভিন্ন এক বাড়িতে যাবার জন্য, ঠিক তখন তার মনোজগতে দেখা দিল হতাশা আর ক্লান্তির বিষাদরেখা :

> মিনা জানতে পারলে না; যখন থেকে আমরা দুজন একা হলাম, এক বাড়িতে থাকবো বলে সুখী হবো বলে ভেবেছি, তখনই আমার কাছে তার রূপ কীভাবে বদলে গেলো। মিনা জানলো না, আমি এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে যাচ্ছি না, আমি এক যন্ত্রণার কুণ্ড থেকে আর এক যন্ত্রণার কুণ্ডে যাচ্ছি।[৩৬]

নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের একটি অংশের ধর্মীয় অসংগতির চিত্র পাওয়া যায় লেখকের 'বান্দা' (১৯৬৭) গল্পে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাদের নৈতিক অসংগতি, কর্তব্যবোধে গরমিল এবং ভাবনাভাষ্যে, বাক্যে ও কর্মে ব্যাপক ব্যবধান। আলোচ্য গল্পের বৃদ্ধ লোকটি মন্টুদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়; খুলনায় থাকলেও মাঝে মাঝে ঢাকায় এলে মন্টুদের বাড়িতে অবস্থান করেন। বৃদ্ধ লোকটি সম্পর্কে লেখকের উচ্চারণ :

> বৃদ্ধলোকটি অদ্ভুত চরিত্রের, নিঃসন্তান, স্ত্রী আছেন তার সম্বন্ধে তিনি তেমন উৎসুক নন। ভদ্রলোকের বয়স প্রায় সত্তর, আজীবন কোনো জীবিকা অবলম্বন করেননি — ব্যবসা বা চাকরি বাকরি কিছুই না। দেশে সামান্য জমিজমা আছে, তাতে সারা বছরের খোরাক চলে না, কোনো এক সময়ে অল্প দিনের জন্য মসজিদের ইমামতি করেছিলেন।[৩৭]

এই বৃদ্ধ অতিথি মন্টুকে নফস দমনের পরামর্শ দেন এবং রাত হলে নিজেই নিয়োজিত হন নফসের অবৈধ চর্চায়। বৃদ্ধের এই নৈতিক অসংগতির চাক্ষুস সাক্ষী স্কুল পড়ুয়া কিশোর মন্টুর মনোলোকে গভীর প্রভাব বিস্তার করে :

> অনেক রাতে মন্টুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে আধো আলো-অন্ধকারে দেখতে পায় বৃদ্ধ মন্টুর বিছানার দিকে তাকিয়ে নিজের বিছানার উপরে দাঁড়িয়ে আছেন, নগ্ন। ভয়ে মন্টু চীৎকার করতে গিয়েও থেমে যায়; কেননা সে শুনতে পায় বৃদ্ধের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর, 'নফ্স দমন কর, এখনো দমন করতে শেখ, আল্লার নাম কর — তিনিই রক্ষাকারী'।[৩৮]

মধ্যবিত্তের ধর্মাচরণের নামে এই অনাচার ও অসংগতির চিত্র তুলে ধরতে আলোচ্য গল্পটি অনন্য হয়ে উঠেছে।

আবদুল মান্নান সৈয়দের 'চাবি' (১৯৬৭) গল্পে মধ্যবিত্তের স্বপ্নবিভোরতা যেমন বিস্তৃত হয়েছে, তেমনি প্রসারিত হয়েছে তাদের স্বপ্নভঙ্গের ইতিকথা। উত্তম পুরুষে বর্ণিত আলোচ্য গল্পের প্রধান চরিত্র চিত্রকলার তরুণ অধ্যাপক বিচ্ছিন্ন ও বিযুক্ত, নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ন। ঢাকা শহরের কোনো এক এলাকার তেতলা বাড়ির তেরো নম্বর ফ্ল্যাটের বাসিন্দা অধ্যাপকের আজন্ম লালিত সাধ ছিল এমন একটি ঘরের যেখানে আপন ভাবনা আর স্বপ্ন নিয়ে স্বচ্ছন্দে করা যায় বসবাস। কিন্তু ঘরের চাবি হারিয়ে হয়ে ওঠে না তার গৃহপ্রবেশ। ফলে তরুণ অধ্যাপকের আপন ঘর আপন থাকে না, হয়ে যায় পরের ঘর, আপন ঘরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটে যায়। লেখক এ গল্পে শাহরিক মধ্যবিত্ত জীবনের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, সম্পর্কহীনতা, অন্যের প্রতি মনোযোগহীনতা, নিস্পৃহতা, জটিল মনোবৃত্তির সুন্দর আলেখ্য নির্মাণ করেছেন। চাবি হারিয়ে তরুণ অধ্যাপক নতুন বাড়িতে চলে গেলেও এখনও সেই বাড়ির চাবির প্রতি তার তীব্র বেদনা অনুভূত হয় :

> তার পর অনেক দিন চলে গেছে। আমি আরেকটি ঘর ভাড়া করেছি। আমি নিজের ঘরের বাইরে নির্বাসিত ও প্রবাসী থেকে এখনো দিন-রাত সেই পুরোনো ঘরের চাবি খুঁজছি; আমি আরেক জনের বাড়িতে থেকে জীবনভর আমার বন্ধ ঘরের আসল চাবি সন্ধান করে যাবো — এই আমার নিয়তি।[৩৯]

সত্তরের দশকে প্রকাশিত আবদুল মান্নান সৈয়দের *চলো যাই পরোক্ষে* (১৯৭৩) এবং *মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা* (১৯৭৭) গল্পগ্রন্থের বেশ কয়েকটি গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের সফল রূপায়ণ লক্ষণীয়। মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা, সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার নিরন্তর প্রয়াস, সঙ্গীবিহীন নিঃসঙ্গতার রূপ অঙ্কনে এ পর্বের গল্পসমূহ ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। পাশাপাশি মধ্যবিত্তের অপ্রকাশ্য অন্তরচারী ভালোবাসার সুবাস কোনো কোনো গল্পে লক্ষ করা যায়।

মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠা তথা সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার নিরন্তর প্রয়াসের চিত্র *চলো যাই পরোক্ষে* গ্রন্থের 'গতবৃষ্টি' (১৯৬৮) ও 'এক সন্ধ্যা' (১৯৬৯) গল্পে লক্ষণীয়। 'গতবৃষ্টি' গল্পের নায়ক মধ্যবিত্ত সার্জেন্ট আজিম অত্যন্ত দক্ষ ও সাহসী পুলিশ কর্মকর্তা। দায়িত্ব পালনে তার সফলতা সকলের কাছে প্রশংসিত। রাতে কর্তব্যরত আজিমের সংকেত অগ্রাহ্য করে একটি ছায়ামূর্তি দ্রুত পালাতে থাকল। সার্জেন্ট আজিম তার পশ্চাদ্ধাবন করল :

> এই চাকরিতে এসে তার কোনো দিন সোজাসুজি পরাজয় হয়নি। সহকর্মী, অধস্তন, উর্ধ্বতন — সবার কাছেই তার সাহস ও কর্মদক্ষতা প্রশংসিত। মাত্র কিছু দিন আগেই সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে সে। এই অতি পরিচিত ঢাকা শহরে রাতে কোনো কিছুই তার অবিজিত থাকেনি। সামনে যে লোকটি তার ভয়ে ছুটছে, তাকে ধরতে পারবেনা সে? আজিম অবশ্য গুলি করতে পারে, কিন্তু হাতে-নাতে সে ধরতে চায়।[৪০]

মধ্যবিত্ত আজিমের আত্মপ্রতিষ্ঠা টিকিয়ে রাখার এক অসাধারণ চিত্র 'গতবৃষ্টি' গল্পটি।

অপরদিকে 'এক সন্ধ্যা' গল্পটি ধারণ করেছে মধ্যবিত্ত শিল্পীর আত্মবিকাশ ও শিল্প-সাফল্যের স্বপ্নকথা। আলোচ্য গল্পে নামহীন দুজন শিল্পীবন্ধু শিল্পচর্চায় আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় হয়ে ওঠে স্বপ্ন-বিভোর। শিল্পীবন্ধুদ্বয়ের একজন কণ্ঠশিল্পী, অপরজন অঙ্কনশিল্পী, তাদের চর্চা অব্যাহত থাকলেও তারা হতে পারে না সাফল্যস্পর্শী। বৈরী পরিবেশ, শিল্পীদের পারস্পরিক সম্প্রীতির অভাব এবং জনগণের উন্নত রুচির সংকট তাদের শিল্পচর্চার পথে সৃষ্টি করে বিরাট অন্তরায়।

মধ্যবিত্তের আত্মপ্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ন রাখার পাশাপাশি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার এক অসাধারণ চিত্র বর্ণিত হয়েছে 'সাপ' (১৯৬৮) গল্পে। জীবনযুদ্ধে নিয়োজিত মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণ অধ্যাপকের চাকরি প্রাপ্তির পর শুরু হয়েছে তার অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। চাকরি পেলেও অবসিত হয়নি তার জীবনের প্রতিকূলতা। পাহাড়ি অঞ্চলে একটি কলেজে অধ্যাপনায় সে নিযুক্ত হয়। দূরবর্তী বিঘ্নসংকুল কর্মস্থলে তাকে বাধ্য হয়ে যোগ দিতে হয়, কারণ :

> আব্বা-আম্মার তেমন ইচ্ছে না থাকলেও সাংসারিক প্রয়োজনটা সম্বন্ধে একটু অবহিত হয়েছি এখন, সুতরাং দ্বিধা করলুম না আর, মন স্থির করলুম।[৪১]

অর্থনৈতিক সচ্ছলতার কথা চিন্তা করে তাই সে পিতা-মাতা, ভাই-বোনকে ছেড়ে এক নতুন জীবনে পদার্পণ করে, যেখানে সন্ধ্যা হলেই শিয়াল ডাকে, ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি জ্বলে আর চারদিকে বিষধর সাপের ভয়াবহ উপদ্রবে মানুষ থাকে শঙ্কিত। এরকম বৈরী পরিবেশের মধ্যে থেকেও মধ্যবিত্ত এই তরুণ অধ্যাপকের চাকরি করতে হয় জীবনের প্রয়োজনে, অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে।

মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক সংকটতাড়িত দুর্বিষহ জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'শেষবাস' (১৯৬৮) ও 'একরাত্রি' (১৯৭০) গল্পে। দুটো গল্পের নায়কই নিম্ন বেতনভুক কেরানি। তাদের স্বল্প আয়ের সংসারে জীবন অতিবাহিত করা দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে অর্থনৈতিক সংকট তাদের বিপন্ন ও বিপর্যস্ত করে তুলেছে। 'শেষবাস' গল্পে সরকারি অফিসের কেরানি রহিমের অর্থনৈতিক সংকটজনিত দুর্বিষহ জীবনের চিত্র নিম্নরূপ :

> দুপুর বেলা বাড়ি না গেলে যেমন কিছু পয়সা বাঁচে, তেমনি শেষ দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে সদরঘাটে তার নতুন কর্মস্থলে গেলে কিছু পয়সা বেঁচে যায় — বাসের পয়সাটা বেঁচে যায়। রোজ অবশ্য হাঁটতে ভালো লাগে না, এক-একদিন লজ্জাই লাগে হোক-না কেরানি।[৪২]

লেখকের সামান্য এই কয়েকটি কথাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে গল্পের নায়ক রহিমের দৈনন্দিন জীবনের যন্ত্রণাদগ্ধ চিত্র। অপরদিকে 'একরাত্রি' গল্পের কেরানি অফিসের হিসাবের কাজ করতে হারিয়ে যায় হিসাবের যান্ত্রিক জগতে। ফলে তার মানসলোকে দেখা দেয় অস্থিরতা। একদিকে শ্রেণি অবস্থান অটুট রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, অন্যদিকে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার তীব্রতা — এ দুয়ের সংঘর্ষে তার মানসলোক বিপন্ন, বিধ্বস্ত। মধ্যবিত্তের এই অর্থনৈতিক সংকটজনিত দুর্বিষহ জীবনের রূপ মান্নান সৈয়দের অসাধারণ মুন্সিয়ানায় গল্পে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

আবদুল মান্নান সৈয়দ মধ্যবিত্তের অপ্রকাশ্য অন্তরচারী ভালোবাসার রূপ তুলে ধরেছেন 'জলপরি'এবং 'ঝড় ও দরোজা' (১৯৭০) গল্পদ্বয়ে। 'জলপরি' গল্পে অধ্যাপকের অন্তর গহনচারী ভালোবাসা রয়ে গেছে অপ্রকাশিত। শম্পার সাথে মাঝে মাঝে সাক্ষাতে ও সংলাপে অধ্যাপকের হৃদয়ে জেগে ওঠে মুগ্ধতা। সেই মুগ্ধতা হয়ে ওঠে ভালোবাসার সীমানাস্পর্শী। কিন্তু তা কেবল অব্যক্ত, অপ্রকাশ্যই থেকে যায়। শম্পার অন্যত্র বিয়ে হয়, স্বামী প্রকৌশলি। কাঙ্ক্ষিত ভালোবাসার মানুষকে বহুদিন পর কাছে পেয়ে অধ্যাপক যেন অতীতে ফিরে যেতে চাইল :

> শম্পার সঙ্গে ফের দেখা হ'লো। সে ঠিক আগের মতন আছে; সেই মোহিনী হাসি, মোহিনী কটাক্ষ, মোহিনী কথা। আমি সব গুলিয়ে ফেললাম; আমার সব বানিয়ে রাখা কথা এলোমেলো হ'য়ে গেলো। পরে শম্পার উপর রাগ হ'লো। কিন্তু খুব ভিতরে আমি খুশি হ'য়ে উঠলাম শম্পা বদলায়নি ব'লে। আমার মন বললো : শম্পা যেন চিরদিন এমনি থাকে। আমার কাছে শম্পা চিরদিন এক রইলো — এই খুশি আমাকে আলোকিত ক'রে তুললো আবার।[৪৩]

'ঝড় ও দরোজা' গল্পে লেখক জনৈক যুবকের একটি প্রেমিক হৃদয়ের বিরহ-ব্যাকুল অভিব্যক্তির চিত্র তুলে ধরেছেন। উত্তম পুরুষে বর্ণিত আলোচ্য গল্পের জনৈক যুবক 'ঢাকা-শহরের সবচেয়ে অভিজাত আবাসিক এলাকার'[৪৪] বাসিন্দা রিনাকে ভালোবাসলেও তার এই ভালোবাসা মূলত একমুখীন : 'আমি ওকে ভালোবাসি, পাগলের মতন ভালোবাসি, কিন্তু ও আমাকে ভালোবাসে কিনা জানি না।'[৪৫] অথচ তার এই একমুখী অপ্রকাশ্য অন্তশ্চারী ভালোবাসার কথা রিনার কাছে অব্যক্তই থেকে যায়। কাউকে ভালোবেসে তাকে মনের কথা বলতে না পারার ব্যর্থতা প্রেমিক হৃদয়ে কতটা নিরাশার সঞ্চার করে তারই সার্থক প্রতিচ্ছবি লেখক এখানে ব্যক্ত করেছেন। মধ্যবিত্ত যুবকটির একতরফা অপ্রকাশ্য ভালোবাসার করুণ পরিণতি চিত্রণে মান্নান সৈয়দ অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

আবদুল মান্নান সৈয়দ শাহরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির একাকিত্ব আর নৈঃসঙ্গ্যের চিত্র তুলে ধরেছেন *মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা'* গ্রন্থের 'সর্বশক্তিমান' (১৯৬৯) গল্পে। গল্পের নায়িকা লিলি, যে গ্রামের এক মধ্যবিত্ত ধার্মিক পরিবার থেকে এসে শহরে ঘর বেঁধেছে স্বামী আবুল হোসেনের সঙ্গে। আবুল হোসেন সর্বদাই ব্যস্ত। অর্থের পেছনে ছুটতে গিয়ে তার স্ত্রীকে সময় দেয়া হয় না। নিঃসন্তান লিলি যন্ত্রের মতো প্রাত্যহিক গৃহকর্ম সম্পাদন করে ক্লান্ত দুপুরে একাকী সময় অতিবাহিত করে। তার এই একাকিত্ব আর নৈঃসঙ্গ্যের মূলে স্বামীর অনুপস্থিতি ক্রিয়াশীল। ফলে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত হয়ে লিলির চিত্তবৈকল্য দেখা দেয় যা লেখকের আত্মভাষ্যে বর্ণিত :

> লিলির হিস্টিরিয়ার সেই শুরু। এক নিঃস্বপ্ন জাগরতা জ্বলে তার চক্ষে, চক্ষের দেয়ালিতে, দু'খণ্ড হাতে, লৌহবর্ণ শরীরে। স্বামীর স্বকীয় আর্যোক্তি তার চারপাশে ঘোরে। আর যখন-তখন দেখা যায় লিলি শুয়ে আছে মাটিতে, ঘাসে বা মেঝেয়। তার চক্ষুদ্বয় চেয়ে আছে, কিন্তু তাকিয়ে নেই।[৪৬]

মধ্যবিত্তের একটি অংশই সর্বদা বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার তাগিদে লেখাপড়া শিখে সচ্ছল কর্মপ্রাপ্তির স্বপ্নে নিমজ্জিত থাকে। লেখকের *নেকড়ে হায়েনা আর তিন পরী* (১৯৯৭) গল্পগ্রন্থের 'সমুদ্র ও সাধারণ মানুষ' (১৯৭৬) গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র তারেক মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি যার

পেশা অধ্যাপনা এবং এই অধ্যাপনা পেশা তার এক বন্ধুর ভাষায় 'মধ্যবিত্ত জীবনের প্রয়োজনীয় পাপ।'[৪৭] অধ্যাপক তারেক তার শ্রেণি-অবস্থানকে বিশ্লেষণ করে বলেছে :

> আমি যদি ধনীর সন্তান হতাম তাহলে নির্ঘাত লেখা-পড়া শিখতাম না, লেখাপড়া শিখেছি বাধ্য হয়ে, স্রেফ চাকরির জন্যে, অন্য কোনো মহত্তর ভাবাবেগে আন্দোলিত হয়ে কিছুতেই নয়। সুতরাং চাকরিটা যখন পেলাম, তখন মনে হলো হাতে স্বর্গ পেলাম। কিন্তু মধ্যবিত্ত জীবনে যেমন হয়, কিছু দিন পরেই সে স্বর্গ থেকে অনিবার্য পতন হলো।[৪৮]

এই অনিবার্য পতন হলো অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। বেঁচে থাকার প্রয়াসে তাকে তাই একটি নিয়মের মধ্যে চলতে হয়। পরিবার-পরিজন থেকে কর্মসূত্রে দূরে অবস্থান করলেও প্রতিমাসে তাকে বেতনের অর্ধেক টাকা পাঠাতে হয়। অবশিষ্ট টাকা দিয়ে তাকে চলতে হয় কোনো রকমে। তবুও

> মাঝে মাঝে মনে হয়; খোদা না-করুন, যদি আমার এক মাসের মাইনের পুরো টাকা হারিয়ে যায়, তাহলেও বোধ হয় আমার এই জীবন যাপনের কোনো তফাৎ হবে না। মোট কথা : জীবন আমার আগেও যেমন একঘেয়ে ছিলো, এখনো দেখি তেম্নি ঢিমে লয়ে-করুণ মন্থর ফ্যাকাশে বিস্বাদ জোলো।[৪৯]

মধ্যবিত্তের এই একঘেয়েমি জীবনাচরণের চিত্র আলোচ্য গ্রন্থের 'দরোজা' (১৯৭৯) শীর্ষক গল্পেও লক্ষণীয়। এ গল্পের কথক চরিত্র শাহরিক জীবনের একঘেয়েমি আর মানসিক টানাপড়েনে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মমুক্তির অন্বেষণে ডুবে থাকে। স্ত্রী রানিকে সন্দেহ করলেও তাদের দাম্পত্য বিচ্ছেদ টিকিয়ে রেখেছে একমাত্র শিশু সন্তান মানিক। তাই একঘেয়েমি আর শূন্যতাভরা জীবন নিয়ে তাকে প্রতিনিয়ত চলতে হয়। নাগরিক মধ্যবিত্তের হার্দ্য ভুবনের স্তরময় জটিলতা আর মানসিক টানাপড়েনের চাপে পড়ে সমাজ-সংসার কোথাও সে স্থির থাকতে পারেনি।

মধ্যবিত্তের আত্মরতি, দাম্পত্য জীবনের শূন্যতা, মনোদৈহিক সংকট এবং নিজ গৃহে পরবাসী মানসিকতার বহুকৌণিক বিন্যাস 'স্বর্গোদ্যান' (১৯৮৭) গল্পে লক্ষণীয়। স্ত্রী মিনুকে কেন্দ্র করে গল্পকথকের প্রেম ও ঈর্ষার দ্বন্দ্ব-জটিল গতিবিধি এ গল্পের মুখ্য বিষয়। মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তরালবর্তী ক্ষয় ও শূন্যতার অনিবার্য প্রভাবে কথক এবং মিনুর দাম্পত্য জীবনে এক সূক্ষ্ম ফাটলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি অন্তরিত প্রেমাকর্ষণ এবং তার প্রায় সমান্তরালে লালিত সন্দেহ ও সংশয় এক দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির মধ্যে নিক্ষেপ করে গল্পকথককে। এ গল্পে গল্পকথকের মনঃসংকটের মূলে বিদ্যমান মধ্যবিত্ত জীবনের বিন্যাসগত অসংগতি যা তাকে ক্রমাগত সমাজ-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি অংশ অত্যন্ত স্বার্থকুশলী এবং তাদের সকল স্বার্থ মূলত অর্থসম্পৃক্ত। সুবিধা লাভের প্রয়োজনে যে কোনো হীনকর্মে তারা পারদর্শী। 'চৈত্রের ঘূর্ণি' (১৯৯০) গল্পের কথক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বিবাহিত; স্ত্রী সোমা আর পুত্র সন্তানকে নিয়ে ঢাকার অভিজাত এক ফ্ল্যাটে বসবাস করে। বিবাহিত হলেও রিনি নামক একটি মেয়ের সঙ্গে তার আন্ত রিক সম্পর্ক সহকর্মী হাফিজ সাহেবের অজানা নয়। রিনি যে কথকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে

আবদ্ধ তার মূলে রয়েছে রিনির স্বার্থ সিদ্ধির জোরালো প্রচেষ্টা। আর এ স্বার্থ যে অর্থ সম্পৃক্ত তা কথকের সহকর্মী হাফিজ সাহেবের মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন এভাবে :

> আপনাকে বলা হয়নি। ক-দিন আগে মেয়েটা এসেছিলো আপনার খোঁজে। আপনি নেই দেখে একটু বসলো। তারপর টেলিফোন করতে চাইলো। আমি বললাম করুন। তারপর কোথায় কোথায় টেলিফোন করলো, কার কার সঙ্গে কথা বললো। আমার কি মনে হয়, জানেন? মেয়েটা কলগার্ল। দেখুন আমি আপনার ওয়েল-উইশার হিসেবে বলছি, এই মেয়ের সঙ্গে মিশবেন না। মেয়েটা ভালো না, ভাই।[৫০]

ভাগ্য-উন্নয়নে, সচ্ছলভাবে বাঁচার আশায় রিনির মতো বহু নারীই স্বার্থসিদ্ধির জন্য হীন কাজ করতেও সংকোচ বোধ করে না।

নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের সার্থক রূপকার আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর গল্পের বাস্তবতায় মধ্যবিত্তের বহু বর্ণিল জীবনচিত্র উপস্থাপনে অসাধারণ নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির চিত্তসংকট, হার্দ্য-জটিলতা, ঈর্ষাতুর পলায়নপরতা, মনোজৈবনিক কামনা-বাসনা, আত্মগ্লানি, দ্বিধাগ্রস্ততা, অপ্রাপ্তির বেদনার অনুপুঙ্খ চিত্রায়ণে আবদুল মান্নান সৈয়দের ছোটগল্প হয়ে উঠেছে শিল্পগুণসমৃদ্ধ।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *নির্বাচিত গল্প*, মুক্তধারা , প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৭, ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।
২. আহমাদ মোস্তফা কামাল সম্পাদিত, আবদুল মান্নান সৈয়দ *শ্রেষ্ঠ গল্প* , বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র , প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ : ২০০৭ , পৃ.৮
৩. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, *বাংলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৩
৪. মুহম্মদ ইদরিস আলী, *বাংলাদেশের উপন্যাস সাহিত্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী : ১৯৪৭-৭০*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৫, পৃ. ২
৫. আব্দুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৪৩
৬. মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, *বাংলাদেশের ছোটগল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের রূপায়ণ : ১৯৪৭-৯০*, প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭
৭. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি*, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা, ১৩৯১, পৃ. ৬২
৮. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাঙলাদেশ', মনসুর মুসা সম্পাদিত *বাঙলাদেশ*, নওরোজ কিতাবিস্তান ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ৩৫
৯. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণী ও বাঙলা সাহিত্য*, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৫৭
১০. অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, রত্না প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ. ১৭৩-৭৪
১১. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, মুক্তধারা, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৭৯-৮০
১২. অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪
১৩. আব্দুল মওদুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২
১৪. গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪
১৫. সৈয়দ আকরম হোসেন, 'বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ ও শিল্প জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গ', *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১২
১৬. মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

১৭. চঞ্চল কুমার বোস, *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ : ১৯৪৭-১৯৯৬*, প্রথম প্রকাশ : ২০০৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭১-৭২
১৮. সুশান্ত মজুমদার সম্পাদিত, *বাংলাদেশের গল্প : সত্তর দশক*, ভূমিকা, প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৯, মে ১৯৯২, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৮
১৯. নাসরিন জাহান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের গল্প : আশির দশক*, পূর্ব কথা, প্রথম প্রকাশ : চৈত্র ১৩৯৯, মার্চ ১৯৯৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭
২০. আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থসমূহ হচ্ছে: *সত্যের মতো বদমাশ* (১৯৬৮), *চলো যাই পরোক্ষে* (১৯৭৩), *মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা* (১৯৭৭), উৎসব (১৯৮৮), *নেকড়ে হায়েনা আর তিন পরী* (১৯৯৭), *মাছ মাংস মাৎসর্যের রূপকথা* (২০০১), *কেন আসিলে ভালোবাসিলে* (২০১০)
২১. আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রকাশিত গল্পসংকলন হচ্ছে : *নির্বাচিত গল্প* (মুক্তধারা : ১৯৮৭), *নির্বাচিত গল্প* (সময় প্রকাশন : ২০০২)
২২. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'সত্যাসত্য', *সত্যের মতো বদমাশ*, প্রথম 'সমাবেশ' অখণ্ড চতুর্থ সংস্করণ : ২০১০, পৃ. ৯
২৩. পূর্বোক্ত
২৪. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'মাতৃহননের নান্দীপাঠ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭
২৬. আব্দুল মান্নান সৈয়দ, 'ভয়', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
২৭. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
২৮. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮
২৯. ঐ, 'সত্যের মতো বদমাশ', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৫
৩০. চঞ্চল কুমার বোস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭
৩১. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'অধঃপতন', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫
৩২. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮
৩৩. ঐ, 'সমীচীন মানব', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩
৩৪. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
৩৫. ঐ, 'সময়ের ঘর', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
৩৬. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩
৩৭. ঐ, 'বান্দা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬
৩৮. ঐ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১
৩৯. ঐ, 'চাবি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯
৪০. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'গতবৃষ্টি', *চলো যাই পরোক্ষে*, বাংলাদেশ বুক করপোরেশন, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ২৯
৪১. ঐ, 'সাপ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
৪২. ঐ, 'শেষবাস', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫
৪৩. ঐ, 'জলপরি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯
৪৪. ঐ, 'ঝড় ও দরোজা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০
৪৫. পূর্বোক্ত
৪৬. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'সর্বশক্তিমান', *মৃত্যুর অধিক লাল ক্ষুধা*, মুক্তধারা, ১৯৭৭, পৃ. ৫০
৪৭. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'সমুদ্র ও সাধারণ মানুষ', *নেকড়ে হায়েনা আর তিন পরী*, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৭৯
৪৮. ঐ, পূর্বোক্ত
৪৯. পূর্বোক্ত
৫০. ঐ, 'চৈত্রের ঘূর্ণি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯